অপারেশন ক্লিন হার্ট : একটি বৈধ সরকারের অবৈধ কাজ

– আ. স. ম. জিয়াউদ্দিন

অপারেশন ক্লিন হার্ট শুরু হওয়ার পর থেকে দীর্ঘ ৮৫ দিন অপেক্ষা করতে হয়েছে এ শিরনাম নির্বাচন করার জন্যে। কারন - অপারেশন ক্লিন হার্ট সম্পর্কে কোন ভাল মন্তব্য করা কষ্টকর ছিল, কষ্টকর ছিল এ জন্যে যে, কোন গনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিপুল জনপ্রিয় সরকার সহজে কোন মানবাধিকার বিরোধী পদক্ষেপ নেবে এটা চিন্তা করা যেমন সাহসের বিষয়, তেমনই পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে বিপুল ভোটে নির্বাচিত সরকার সম্পর্কে মন্তব্য করাও শোভন নয় - বিপদজ্জনকও বটে।

বিগত ১ লা অক্টোবর ২০০০ সালে বিপুল বিজয় অর্জন করে ক্ষমতায় বসে সরকারের শীর্ষ মহল বিরোধীদের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করে তাদের বিরূদ্ধে নিধন যঞ্জ চালাতে থাকে - যা নীচের স্থরেও ছড়িয়ে যায় দ্রুত - ক্রমান্বয়ে নির্যাতন চলে যায় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। অন্যদিকে তত্বাবধায়ক সরকারের সময় থেকে শুরু হওয়া সংখ্যালঘুর উপর নির্যাতনের মাত্রা অসহনীয় অবস্থায় চলে যায়। বহুমুখী সমস্যায় জর্জরিত বাংলাদেশের সরকার পরিচালনার জন্যে যে রকম দক্ষ ও সৎ ব্যবস্থাপনা দরকার - বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সে রকম দক্ষ ব্যবস্থাপনা গড়তে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে - অন্যদিকে দলীয় ও মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের চাপে সরকার প্রশাসনে ব্যাপক পরিবর্তন আনে যা মূলত প্রশাসনে এনে দেয় স্থবিরতা। ৬০ সদস্যের জাম্বো মন্ত্রীসভায় স্থান পাওয়া মন্ত্রীদের প্রজ্ঞা ও দক্ষতার চেয়ে আনুগত্য ও আঞ্চলিকতাকে গুরূত্ব দেওয়ায় গুরূত্বপূর্ন মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে এমন সকল ব্যক্তিদের হাতে যাদের অতীত কোন ভাবেই সৎ কোন ইমেজ হাজির করে না। যেমন স্বরাস্ট্র মন্ত্রীর বিরূদ্ধে মস্কো দুতাবাসে মিলিটারী এটাচে থাকা অবস্থায় ডিপ্লোমেটিক সুবিধা ব্যবহার করে কম্পিউটার চোরাচালানীর কাহিনী তৎকালীন মস্কোবাসী বাঙালীদের মুখেমুখে । অন্যদিকে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বিরূদ্ধে যমুনা গ্রুপের মালিক সোনা চোরাচালালীর অভিযোগ এনেছে - জনশ্রুতি এরা দু'জন চোরাচালানের অংশিদার ছিলেন। আরেকটি গুরূত্বপূর্ন দফতর আইন, যার দায়িত্বে নিয়োজিত মওদুদ আহম্মদের এরশাদের শেষ দিনে উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে - এরশাদের পদত্যাগ কতবড় বেআইনী কা - সে ব্যাখ্যার কথা আশা করা যায় অনেকের মনে আছে, যদিও কয়েক ঘন্টার মধ্যে তাকেই প্রথম পদত্যাগ করে বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের জন্যে স্থান করে দিতে হয়েছিল। এদের নেপথ্য ভূমিকায় আচমকা সারাদেশে ২৪ হাজার সেনা নামানো হয়, যার যথাযথ আইনী ব্যাখ্যা প্রদানে ব্যর্থ হন সরকারের ধূর্ত আইনমন্ত্রী, এমনকি স্বরাস্ট্রমন্ত্রী তার ব্যর্থতার কথাও অস্বীকার করলেন। তবে কেন বেআইনী ভাবে সেনা নামানো হলো - ৬০ জন মন্ত্রী আর অর্ধ ডজন উপদেষ্টা জবাব দানে ব্যর্থ হওয়ার পর সরকার পিআরও নামে একটা পদ তৈরী করে । যা আসলে হিজ মাষ্টার ভয়েস হিসাবে কতগুলো গৎবাধাঁ কথা বলে যেতে থাকলো । যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো - ১৯৭৪ সালে সরকার সেনা নামিয়ে ছিলো, সেনা বাহিনীর হাতে কেহ মারা যায় নি, ...জন তালিকা ভুক্ত সন্ত্রাসী গ্রেফতার হয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। শুরূটা কোন ভাবেই সরকারের জন্যে সুখকর হয়নি। দেশে - বিদেশে সরকারের পদক্ষেপ হয়েছে নিন্দিত। আমেরিকা, বিশ্বব্যাংক, এমনেষ্টি, ইউরোপীয় ইউনিয়ন সময় সময় সরকারের সমালোচনা করেছে - নিন্দা করেছে - উপদেশ দিয়েছে। ভাবমুর্তি সচেতন সরকার নিজেই নিজের ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করেছেন এ পদক্ষেপের মাধ্যমে।

তারপরও আশাবাদী মানুষ আশায় বুকবাঁধে। মনে করে শেষ ভাল যার সব ভাল তার। একটা গনতান্ত্রিক সরকার নিশ্চয় নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষায় সঠিক পদক্ষেপ নেবেন, কারন তারা সংবিধানের আলোকে নিবাচিত, মানবাধিকার রক্ষায় শপথকারী, তারা কি সামরিক সরকারের মতো কোন অসাংবিধানিক - মানবাধিকার লঙ্ঘনের কোন পদক্ষেপ নিতে পারে ? সরকারের বিশাল মন্ত্রীসভার কেহ না কেহ বিবেকের তাড়নায় বলবে - এটা ঠিক না, প্লিজ থামুন।

সাবধানী মানুষ সব সময় জানতে চেয়েছে, যারা মারা যাচ্ছে তারা কারা, কি অপরাধ ছিল তাদের? ধূর্ত আইন মন্ত্রী বলেছেন," the army would not be indemnified for deaths in its custody" , তিনি আরো বলেন," If someone dies in police custody, the police official concerned will have to inform the nearest magistrate of the death as per Police Manual 302 (d)." (ডেইলী ষ্টার, নভেম্বর ১৩, ২০০২)। তিনি বরারর বলেন - " আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে"। কিন্তু জানুয়ারী ৮, ২০০৩ তারিখে একই ব্যক্তি আবার আইনী ব্যাখ্য নিয়ে হাজির হলেন, কিন্তু প্রেক্ষাপট সম্পূর্ন বিপরীত। ৮৫ দিনে যত মানুষ নিহত হয়েছে, যত মানুষ আহত হয়েছে বা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন, তারা যাতে তাদের সাংবিধানিক অধিকার এবং মানবাধিকারের থেকে বঞ্চিত হয়, চিরতরে যে তারা বিচারের দ্বারস্থ হতে না পারে সে জন্যে সংসদকে পাশ কাটিয়ে একটি অর্ডিনেন্স জারী করেছেন মহামান্য প্রেসিডেন্ট - তার আইনী ব্যাখ্যা তো দেবেন আইনমন্ত্রী। মাত্র ৬০ দিন আগের তার বলা কথা গুলো তিনি কি ভুলে গেলেন? না । এটাই তাদের বৈশিষ্ট্য, না হলে কি পতিত উপরাষ্ট্রপতি থেকে নির্বাচিত সরকারের আইন মন্ত্রক! এবার তিনি বল্লেন," the members of the joint forces have been given indemnity for their noteworthy role in bolstering internal security, public safety, curbing terrorism and recovering illegal arms across the country during the drive." তখন বল্লেন, লাগবে না, এখন কেন দরকার হলো, সে ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। এতো গেল আইন মন্ত্রীর কথা - বাংলাদেশের আইন যার কথা মতো চলে।

এবার আসা যাক, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বিষয়ে, যার সততা সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে। আর তার যোগ্যতা হচ্ছে বসের সামনে কেঁদে ফেলা আর মানুষকে সান্তনা দেওয়া এ বলে - আল্লার মাল আল্লা নিয়ে গেছে। সেনা নামানোর আগে একবারও তিনি বলেননি যে, তিনি পারছেন না অর্থাৎ তিনি ব্যর্থ। পুলিশের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে যা পড়ে তা করতে না পাড়ার ফলেই সেনা আগমন, এ সত্যটা নানান ভাবে এড়ানো হয়েছে। কোটি কোটি টাকার "পাবলিক মানি" ব্যয় করে আইন শৃংখলা ঠিক রাখতে ব্যর্থ যিনি, তার নিশ্চয় জনগনের কাছে দায় বদ্ধতা আছে। কিন্তু সেটা হবে কেন? তিনি বরাবর বলে গেলেন সব ঠিক আছে - অবস্থা উন্নতি হচ্ছে, খুন বাড়লেও অপরাধ কমেছে - তাহলে আর্মি কেন? এখন তিনি বলছেন, " আমি পুরাপুরি ব্যর্থ হয়েছিলাম"। এবং তিনি স্বপদে বহাল রয়েছেন।

সবশেষে আসে প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কথা। একটা কথা প্রচলিত আছে তিনি আপোষহীন । ৯০ এর আন্দোলনের সময় যায় যায় দিনের প্রচারিত তার এ ভাবমূর্তি ১৯৯৯ সালে এরশাদের সাথে এক মঞ্চে গিয়েও ম্লান হয়নি। তিনি গোড়া থেকেই এক কথার মানুষ। সব ঠিক আছে, আর যা হচ্ছে বিরোধী দলের চক্রান্ত। বিগত দিনের রাজনীতির থেকে এটা তিনি পরিষ্কার যে, তিনি গনতন্ত্র বা সংসদকে তেমন একটা আমলে নেন না। কেন এবং কিসের ভিত্তিতে সেনা মোতায়েন - তার আইনগত ভিত্তিই বা কি অথবা কিই বা পরিকল্পনা, মানুষ কিছুই জানতে পারলো না। এক কথায়, দেশের মানুষের কাছে দায়বদ্ধতা বা জবাবদিহীতার নূন্যতম ইচ্ছার নিদর্শন মানুষ পায়নি। দেড় বৎসর যাবৎ সংসদ গঠিত হওয়ার পরও সংসদীয় কমিটি গঠনের কোন উদ্দ্যেগ দেখা যায়নি, যা সংসদীয় গনতন্ত্রের জন্যে অপরিহার্য । সংসদ ও সংবিধানকে পাশ কাটিয়ে যে ভাবে সেনা নামানো হয়েছে, তা পরিষ্কার মানুষকে ব্লাকমেইলিং করা হয়েছে। সরকারী দল সন্ত্রাস করছে, বুয়েটে সনি মারা গেল তার দলের কর্মীর গুলিতে - তাকে আজ পর্যন্ত ধরা যায়নি - এমনকি সাম্প্রতিক মোহাম্মদপুরে সরকারীদলের অন্তঃকোন্দলের শিকার হয়ে মারা গেল একজন, সেখানে সেনাবাহিনী ১১,০০০ হাজার সন্ত্রাসী ধরলো তালিকা অনুযায়ী - যাতে মোষ্ট ওয়ান্টেড সন্ত্রাসীরা কি ছিল - কেন তারা ধরা পড়লো না, মানুষ কখনই তা যানতে পারবে না। এদিকে আর্মির ভয় দেখিয়ে ছিনতাই বন্ধ করে সরকার যাদের বাহবা পেলেন, তাদের গয়না কেনার টাকার উৎস নিয়ে কেহ প্রশ্ন তুলতো না। সরকারের ভূমিকা হলো ছিঁচকে চোরদের তাড়িয়ে বড় চোরদের চৌর্যবৃত্তিকে সহজ করে দেওয়া ।

এতক্ষন "অপারেশন ক্লিন হার্ট" প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত প্রধান ব্যক্তিদের সম্পর্কে সামান্য ভূমিকা দেওয়া হলো। আপাত ১ম পর্যায়ের শেষ হওয়া অপারেশনের থেকে মানুষ কি পেল। ৪৭ টা প্রশ্ন বোধক মৃত্যু, ৪০০০ পঙ্গু মানুষ, হাজার হাজার বিষন্ন পরিবার - যারা স্বজনের মৃত্যুর জন্যে বিচার প্রার্থী হতে পারবে না। প্রশ্ন হচ্ছে, মোষ্ট ওয়ান্টে ক্রিমিনালরা ধরা পড়লো না, - যে ৪৭ জন মারা গেল, তাদের অধিকাংশ ছিলেন নিরাপরাধ - এ অবস্থায় কেন হঠাৎ করে রাশ টেনে ধরা হলো । মাত্র ২০ দিন পর সংসদ অধিবেশন - এ অবস্থায় কেন তাড়াহুড়া করে "ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ" জারি করা হলো , সংসদে পাশ করাতেই হবে। যারা বাংলাদেশের খবরাখবর নিয়মিত রাখে, তাদের কাছে এটা পরিষ্কার যে, সরকার ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সেনা মোতায়েন করে তাদের পরাজয় ডেকে আনতে চায় না, ফলে দেখা যাবে নির্বাচনের পর নতুন অজুহাতে সেনা নামানো হবে। দুঃখ হয় নির্বাচন কমিশনারের জন্যে, যিনি সরকারকে সংবিধান লংঘনের কথা মনে করিয়ে দেন - যাদের জন্ম ও বিকাশ সামরিক শাসন নামক জংলী ব্যবস্থায় এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে সংবিধান ও কোর্টকে অবজ্ঞার সর্বোচ্চ রেকর্ড করে প্রমান করেছে তারা তাদের জন্মের সাথে বেঈমানী করবে না।

কেন এ মৃত্যুর জন্যে বিচার চাওয়া যাবেনা। কেনই বা অপরিকল্পিত - বেআইনী ভাবে এ অভিযান চালানো হলো। এ জন্যে দায়ী কে বা কারা? যারা ইনডেমনিটি দিয়ে সুরক্ষা চাচ্ছে তাদের কি এ অধিকার আছে? আসুন দেখা যাক কি কি প্রেক্ষাপটে এ অবস্থার সৃষ্টি হলো এবং এ জন্যে দায়ী কারা।

১) অভিযান আরম্ভঃ হঠাৎ করে সেনা নামানোর সিদ্ধান্ত ছিল চরম ভুল। মানুষ সন্ত্রাসের কাছে ছিল জিম্মি- এ অবস্থায় সস্তা বাহবা পাওয়ার আশায় করা হয়ে থাকলে তা ছিল মানুষের অসহায়ত্বকে ব্লাকমেল করার শামিল। সমস্যার জন্যে স্থায়ী সমাধান না খোঁজে টোটকা সমাধান করার জন্যে যারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা সংবিধান ও মানবাধিকার লংঘনের দায়ে দায়ী হবেন। এ জন্যে প্রধানত দায়ী হবেন আইন মন্ত্রী - যার দায়ীত্ব সাংবিধানিক শাসন সমুন্নত রাখা, যা তিনি রাখতে পারেন নি। ফলে মানুষের সাংবিধানিক অধিকার হয়েছে ক্ষুন্ন, অসহায় ভাবে নির্যাতিত হয়েছেন হাজার হাজার মানুষ - জীবন দিয়েছেন ৪৭ জন।

২) অভিযান চলাকালীন সময়ঃ বলা হয়েছে যৌথ ভাবে কাজ করবে সেনা-পুলিশ-বিডিআর। দৃশ্যতঃ সেনাবাহিনী পুলিশের কাছে কোন সহযোগীতা পায়নি। ফলে সেনারা নিজস্ব তথ্যের ভিত্তিতে কাজ করতে গিয়ে হয়েছে বিভ্রান্ত - নির্যাতিত হয়েছেন নিরাপরাধ মানুষ। সেনাবাহিনীর জন্যে সুনিদিষ্ট নীতিমালা না থাকায় রাস্তা ঘাটে অপমানিত হয়েছে সাধারন মানুষ । পুরো অভিযানে পুলিশের ভুমিকা ছিল রহস্যময়। যেমন কালা ফারুক ধরার পর পুলিশ সেনাবাহিনীকে পাশ কাটিয়ে যায় এবং খুন করে ফেলে। সেনারা ছিল অসহায়। অন্যদিকে নরসিংদীতে বংশানুক্রমিক বাজি পটকা ব্যবসার জন্যে সেনাবাহিনীর হাতে নির্যাতিত হলো গ্রামবাসী আর সত্য ভাষণের দায়ে চাকুরী হারালেন দু'জন পুলিশ কর্মকর্তা। অন্যদিকে সেনাবাহিনীকে দিয়ে সাবের চৌধুরী, শেখ সেলিম, তালুকদার খালেক প্রেফতার ও আওয়ামী লীগের তথ্যকেন্দ্রে অভিযান চালিয়ে বিতর্কিত করা হলো পুরো অভিযানের উদ্দেশ্যকে। এ সমন্বয়হীনতা ও পুলিশ বিভাগের অসহযোগীতার

জন্যে দায়ী হবেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী যিনি প্রকৃত পক্ষে যিনি পুরো কাজটার জন্যে শপথ গ্রহন করেছেন। মানুষকে এক সন্ত্রাসের পরিবেশ থেকে আরেক সন্ত্রসের পরিবেশে ঠেলে দিয়েছেন । বেসরকারী সন্ত্রাসীদের সন্ত্রাসের জন্যে বিচার পাওয়ার আশা থাকতো, কিন্তু রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ফলে ক্ষতিগ্রস্থদের বিচারের পথ বন্ধ করে দেওয়ার অবস্থা সৃষ্টির মুল নায়ক হিসাবে তিনি একদিন কাঠগড়ায় দাঁড়াবেন।

৩) অভিযানের রাজনৈতিক সমাপ্তি ঃ অন্য আরেক জন দায়ী হবেন ৪৭ টি প্রশ্নবোধক মৃত্যুর - হাজারো মানুষের পঙ্গুত্ব বরণের আর অসংখ্য মানুষের অপমানের জন্যে। তিনি হলেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী। যিনি এধারে পূবোক্ত দু'জনের নিয়ন্ত্রনকারী - যিনি যথাসময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ- সমালোচনা করলে ক্ষিপ্ত হন - খড়গহস্ত হন সুপরামর্শদানকারীর প্রতি। তার শুধু মাত্র পছন্দ তোষামোদকারীদের। তিনি অন্যদিকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দায়িত্বে থাকায় সেনাবাহিনীর অন্যায় ও বেআইনী কাজ গুলোর দায়দায়িত্ব তার উপর বর্তায় । সংবিধান ও মানবাধিকার রক্ষার শপথ গ্রহনকারী একজন শুধুমাত্র নিজের ও একদল লোকের সুরক্ষার জন্যে "ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ" জারির কথা বিবেচনা করতে পারে - তিনি আর যাই হোক না কেন, তার সাংবিধানিক শপথ ভঙ্গের দায় এড়াতে পারবেন না। ৪ বারে ৫ টি করে মোট ২০ জন এম পির সমান নির্বাচিত একজন আইন প্রণেতা সংবিধানের ২৬ ধারা জানেন না বা মানেন না - এটা বিশ্বাস করা কঠিন। ২৬ ধারা অনুসারে সকল নাগরিক আইনের চোখে সমান এবং সকল নাগরিকের আইনের আশ্রয় পাওয়ার সমান অধিকার আছে। অন্যদিকে ৪৬ ধারায় বিশেষ অবস্থায় সংসদের অনুমোন সাপেক্ষে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে আইনের থেকে দুরে রাখা যায়।

প্রশ্ন হচ্ছে - ১৭ই অক্টোবর ২০০২ থেকে ৯ই জানুয়ারী ২০০৩ পর্যন্ত সকল অপরাধের অপরাধীদের রেয়াদ দেওয়ায় একদিকে যেমন সেনাবাহিনী সুবিধা পাচ্ছে, তেমনি পাচ্ছে পুলিশ আর প্রধানমন্ত্রীসহ নীতিনির্ধারকরা। এ রকম "ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ" জারি করেছিল খন্দকার মোশতাক আহম্মদ ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট থেকে ৩রা নভেম্বর পর্যন্ত সকল খুনিদের রক্ষার লক্ষ্যে যা পরে সামরিক শাসক জে. জিয়াউর রহমান সামরিক শাসনের বৈধতাদানকারী ৫ম সংশোধনীর অংশ হিসাবে সংবিধানের অন্তভূক্ত করেন। ১৯৯৬ সালে জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করে আওয়ামীলীগ সরকার। এবার আবার খালেদা জিয়া সংবিধানকে কলঙ্কিত করার পদক্ষেপ নিয়েছে আর সেসময়ের বুদ্ধিদাতা ওবায়েদুর রহমান ঘটনাচক্রে সরকারের নীতি নির্ধারকদের একজন।

আরেকজন বিশিষ্ট ব্যাক্তি মানবাধিকার বিরোধী কর্মকান্ডের সাথে জড়িত হয়ে শুধু মাত্র নিজেকে অপমানিত করেননি - অপমানিত করেছেন রাষ্ট্রপতির পদকেও। মাত্র কয়েকদিন আগে আটক অবস্থায় মৃত্যুকে মানবতা বিরোধী আখ্যায়িক করে কিভাবে "ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ" অনুমোদন করলেন তা হয়তো ভবিষ্যত গবেষকদের কাছে একটা বড় গবেষণার কাজ হবে। ক্ষমতার জন্যে কিভাবে বিবেক বলি দিতে হয় তা প্রদর্শন করে পদত্যাগী প্রেসিডেন্ট বি. চৌধুরীকে চরম লজ্জা দিয়েছেন । আইনী মারপ্যঁচে ইয়াজউদ্দিন হয়তো অপরাধী হবেন না কিন্তু ইতিহাসের বিধানে তার নাম চলে যাবে খন্দকার মোশতাকের পাশে - একজন শিক্ষাবিদ - শিক্ষকের জন্যে এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে।

এটা খুবই দুঃখজনক যে, গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত একটি সরকার নিজেদের কার্যকলাপের মাধ্যমে খুনী ও অবৈধ সরকারের সমান সারিতে নেমে এসেছে। বাংলাদেশের সকল পত্রিকায় "ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ" জারির প্রতিবেদনে খালেদা জিয়ার নামের সাথে খন্দকার মোশতাক আহম্মদের নাম লিখেছে, লিখতে বাধ্য হয়েছে। এটাই ইতিহাসের নির্মম বিধান। যেমন খন্দকার মোশতাক আহম্মদের নাম উচ্চারনের সময় স্বাভাবিক ভাবে মীর জাফরের নাম চলে আসে।

একবিংশ শতাব্দির মাঝে বাস করে যারা মনে করেন - আইন করে সভ্যতার চাকাকে উল্টা ঘুরাবেন, তাদের জন্যে করুনা করা ছাড়া আর কি বা করার আছে। লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো সাবেক প্রধানমন্ত্রী আইন করে কিছু রাষ্ট্রীয় সুবিধা নেওয়ার ব্যবস্থা করে ছিলেন, আর এ সরকার এসেই সংবিধানের ২৬ ধারার বলে তা বাতিল করলেন। আবার তারা ২৬ ধারা অবজ্ঞা করে নিজেদের রক্ষার আইন করছে , কি অদ্ভুদ!